সশরীরে হাজির। তাকে বের করে দিতে গেলে সে পিস্তল দেখায়। পুলিশ ডাকলে তারা আসে না। ডিসি সাহেব না করে দিয়েছেন।

-শোনেন, ব্যাপারটা আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ত্যাদরামি করলে খবর আছে। হুইপের সঙ্গে পার্ট লও! শালা! আজ থেকে বউ মেয়েকে ঘরের বাহির হইতে দিবি না। ওদের পেলে নাচাব বুঝলি! কুত্ত নাচ! ঝাঁকা নাকা ঝাঁকা - একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করে সে। 'যেদিন কামালকে খালাস করবি সেইদিন হইতে সব ওকে হবে। আর নয়তো আ হাঃ হাঃ...'

সালাম বেরিয়ে যেতেই হাসান সাহেব ডিসির রুমে গেলেন। সব শুনে তিনি বললেন কিছু করার নেই। আপনিই তো এর জন্য দায়ী?

আমি! আর্তনাদ করে উঠেন হাসান সাহেব।!

জীবনে এমন সহায় বোধ করেননি। বাড়ি ফেরার সময় দেখেন গাড়িটা নেই তাকে। রিকশা করে বাড়ি ফিরতে হলো। বাসায় এসে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। অনেকক্ষণ ঘুম থেকে সবাইকে ডাকলেন। তিমাকে বললেন, মা কয়েকদিন তুই বাইরে বেরুস না।

-কেন বাবা? স্কুলে যাব না?

-না, বাসায় পড়াশোনা কর। শাওন বেরুবে না।

- কেন বাবা?

আমাকে হুমকি দেয়া হয়েছে। একটা মামলার রায় দেব তো। ওপর থেকে চাপ এসেছে মিথ্যা রায় দিতে হবে। আমি তাতে রাজি হচ্ছি না। তাই তোমাদের ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছে।

বাবা অন্যরাও তো চাকরি করছে, ওদের তো কোনো সমস্যা হয় না, তিমা অভিমান করে বলে।

হ্যাঁ, মা, ওদের মতো আমি নই।

রাতে শোয়ার সময় রোকেয়া বললো, তুমি না হয় তাকে খালাস করে দাও! ঝামেলা করে লাভ আছে!

একজন নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দেব! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবে?

রোকেয়া আর বলে না কিছু!

-শালা, ওই চাকরিই আমি করব না। রোকেয়া অদ্ভুতভাবে তাকায়। কখনো এমন কথা শোনেনি তার মুখে।

হাসান সাহেব জানেন এটা তার পক্ষে অসম্ভব। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছেন। নিজের সংসার চালিয়ে গ্রামের ভাই-বোনদের সংসারও দেখতে হয়। মায়ের দ্বিতীয় সংসারের ভাই-বোনরা এখনো গরিব।

দুদিন পরে বুঝতে পারলেন সব কিছু বদলে যাচ্ছে। অফিসের সবাই অসহযোগিতা করছে। বাসায় একটা বদ্ধ বাতাস, সবাই তার জন্য সাফার করছে। দিশেহারা হয়ে পড়েন। এইভাবে থাকা যায় না। ঢাকাতে বাসাভাড়া নিতে হবে - খুব টানাটানি পড়ে যাবে। রোকেয়াকে গোপনে পাঠিয়ে দেন তিনি।

রোকেয়া দুদিন ঘুরে মনের মতো বাসা পান না। তাকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে ভাড়া নিতে হবে। পরিচিত এক টিএনও-এর কাছে গেল রোকেয়া। তিনি বেশ কয়েকটা বাড়ির মালিক। কিন্তু কোনো বাসা খালি নেই। এখানে এসে আবার তিমাকে ভর্তি করতে হবে, শাওনকেও। ওহ এতো ঝামেলা। অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। শেষমেশ একটা বাসা ঠিক হয় নাখাল পাড়ার দিকে। সাড়ে চার হাজার টাকা ভাড়া। আবার ফিরে আসে রোকেয়া। শাওন, তিমা বিশ্বাসই করতে পারছে না। তাদের ফোন ছাড়া, গাড়ি ছাড়া জরাজীর্ণ বাসায় থাকতে হবে।

- কোনো ফোন নেই?

না মা, এতো টাকা পাবো কোথায়? তোরা বড় হ, দেখবি কতো আরাম আয়েশ!

হাসান সাহেবের দু'চোখ ফেটে জল আসে। অনেক সাবধানে চলতে হবে। ওরা পারবে তো? কখনো এমন টানাটানি দেখেনি ওরা।

শাওন বাবাকে বলে, আমরা কি গরিব হয়ে গেছি বাবা?

না, বাবা বড়লোক হলাম! কয়জন আছে বল? বলতে বলতে চোখ মুছেন হাসান সাহেব।

সব কিছু গুছিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে দিতে আসেন হাসান সাহেব। হাসান সাহেব হঠাৎ ছল ছল কণ্ঠে স্ত্রীর হাত দুটো হাতে নিয়ে বললেন, আমার জন্য তোমাদের সবাইকে সাফার করতে হচ্ছে! কি করবো বলো? কখনো কোনো অন্যায় করিনি। আজ এতো বড় অন্যায় কীভাবে করি?

মামলার রায় আগামীকাল সকালে ঘোষণা করবেন। হুইপ সাহেব আরো একবার ফোন করেছেন। ডগ সালাম বারবার হুমকি দিচ্ছে। সব কিছু কেমন যেন দিশেহারা, কোথাও কেউ নেই যেন। নাকি খালাস করে দেব? কি হবে আমি একা লড়ে! চারদিকে সবাই ধান্ধায় আছে, হরিলুট করছে দেশের সম্পদ! তিনি একা কীভাবে উল্টো স্রোতে চলবেন? আর তখনি পাশের বাসা থেকে ফোন করে তিমা, বাবা তোমাকে মিস করছি।

আমিও মা।

বাবা তুমি সাহস রাখ। আমিও তোমার মতো সৎ হবো। শাওনও বলেছে সে তোমার মতো হবে!

হাসান সাহেব আনন্দে কেঁদে ফেলেন। তিনি একা নন। এরা আসছে। এরা একদিন এসব জঞ্জাল সরিয়ে বিজয় কেতন উড়াবে। তখন আর সৎ কাজ করার জন্য এই রকম এলোমেলো হবে না সংসার। পালিয়ে বেড়াতে হবে না। আজ তিমা, শাওন তাকে আদর্শ হিসাবে নিচ্ছে। ওদের দেখে অন্যরা শিখবে। হঠাৎ তার অসহায় ভাবটা চলে যায়। জ্বলে উঠে স্বপ্নের বাতিগুলো - আশার আলো ছড়িয়ে পড়ে নবদিগন্তে।

রায়ের শেষ অংশটা লিখে ফেলেন।... কামালকে আট বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হল...। টেলিফোনটা বেজে ওঠে। উঠুক - তিনি পরোয়া করেন না হুইপকে, পরোয়া করেন না ডগ সালামকে! এখনো আশা আছে এই সমাজের এই জাতির।

প্রবাসের গল্প

৬ এপ্রিল পর্যন্ত প্রবাসী লেখকদের ৭টি গল্প আমরা হাতে পেয়েছি। অনেকে বিদেশ থেকে ফোন করেও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন কিনা জানতে চেয়েছেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার জন্যে ফিলিপ্‌স বাল্বের একটি প্যাকেট পাঠানোর শর্ত ছিল। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে যেহেতু এই শর্ত পূরণ করা সম্ভব ছিল না, তাই আমরা প্রবাসীদের গল্প প্রতিযোগিতার আওতায় আনতে পারিনি। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে না পারলেও বাছাই করে একটি গল্প ছাপানো হলো।

আমি তোমাদের লোক

আব্দুল নাছির

হিথরো বিমান বন্দর থেকে ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের বিমান আকাশে উড্ডয়নের পর থেকেই শমীর পাশে বসা বিদেশী ভদ্রলোকটি ড্রিংক করা শুরু করেছিল। ড্রিংকের ফাঁকে ফাঁকে সে অনবরত কথা বলছে শমীর সঙ্গে। ভদ্রলোকের গন্তব্য বাংলাদেশের সিলেট। সিলেটের কোনো এক জায়গায় চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে তার বাংলাদেশী বাবা। বাবার মৃত্যুবার্ষিকী আগত প্রায় তাই ভদ্রলোকের এই বিমান যাত্রা। ভদ্রলোক বলেই চলেছে, প্রতিবছর তার বাবার মৃত্যুর মাসটাতে তাকে এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণা তাড়া করে। তাই যতক্ষণ সে তার বাবার অন্তিমশয্যার পাশে যেয়ে দাঁড়াতে না পারে ততক্ষণ স্বস্তি পায় না। শমীর মা জয়া বসেছিল মাঝের সারির সিটে। সেখানে থেকে বার বার বিরক্তি ভরা তীক্ষ্ণ সৃষ্টি ছুঁড়ে দিচ্ছিল তার ছেলের দিকে। জয়া পেশায় স্কুল শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষক হলে কি হবে? রক্ষণশীল এবং উদার মনোভাবের এক মিশ্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার। মদ পান করে যে এক কথায় প্রকাশ করলে হয় 'মদ্যপ'। আর মদ্যপ মানেই আমাদের দেশের শিক্ষকদের কাছে গা ঘিন ঘিন করা এক খারাপ চরিত্রের ব্যক্তি। শমী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার মাকে বলে, ভদ্রলোকের বুকের ভেতর অনেক ব্যথা জন্মে আছে। সে কথাই সে আমাকে বলছে। ছেলের কথা শোনার পর জয়ার ভাবনার পাখা মেলে অন্যদিকে। জয়ার ভাই শুভ। শুভকে নিয়ে এক বিব্রতকর অবস্থা তার। হঠাৎ করেই একদিন শুভ পাড়ি জমিয়েছিল ইউরোপে। স্বপ্ন দেখেছিল এক সচ্ছল জীবনের। কিন্তু হিসেব মেলেনি শুভর। বাস্তবতার ধাক্কা খেতে খেতে সে একদিন কি যেন ভেবে বিয়ে করে বসল বিদেশিনী 'মেম'কে। এরপর তাদের সংসারে এলো সন্তান। সাদা আর শ্যামলার মিশ্রণে

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

সন্তানের রূপ এক কথায় অপূর্ব। বিদেশী প্রতিবেশীরা সন্তানের রূপের বর্ণনায় সব সময় ছিল পঞ্চমুখ। কিন্তু জয়া পড়ে গেল বিপদে। তথাকথিত সমাজ এবং পরিচিত জনের কাছে তাকে সব সময় কৈফিয়ত দিতে হতো শুভর বিদেশ অবস্থান, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, মেম বিয়ে করা ও সন্তান প্রসঙ্গে । এ যেন বিকালে চা দিয়ে মুড়ি-চানাচুর খাওয়ার চেয়েও মুখরোচক। শুভ বিরক্ত হয়ে জয়াকে প্রশ্ন করতো, সমাজ কি? তাদের কাছে তোমাকে এতকিছু বর্ণনা করতে হবে কেন? তার কোনো সদুত্তর শুভ কখনও পায়নি জয়ার কাছ থেকে। জয়া সব সময় বলেছে, তুই দেশে থাকিস না, তুই ওসব বুঝবি না। জয়ার সমস্যা আরও বেড়ে গেল ভাইয়ের দাম্পত্য জীবন ভেঙে যাওয়াতে। তথাকথিত সমাজের আগ্রহ যেন আরও বেড়ে গেল। তারা নাকি জানতো এ সংসার টিকবে না। কেননা ইউরোপীয়ান মেয়েরা সংসার করতে জানে না। তাদের প্রশ্ন আরও বেড়ে গেল। শুভ খ্রিস্টান হয়ে গেছে কিনা, মদ পান করে কিনা এসবের পাশাপাশি এ কথাও তাদের জিজ্ঞেস করতে ভুল হয় না, সে সিটিজেনশিপ পেয়েছে কিনা, দেশে আবার বিয়ে করবে কিনা। দেশে বিয়ে করলে নাকি শুভর জীবনযাত্রা সহজ হয়ে যাবে, জীবনে স্থিতিশীলতা আসবে। শুভকেও সরাসরি একথা বলেছে অনেকে। কিন্তু শুভ কেমন যেন দ্বিধান্বিত। তার মধ্যে সব সময় একটা নেতিবাচক মনোভাব কাজ করে। তাই তার পরিচিত জনেরা তার মুখের ওপর একথাও শুনিয়ে দিয়েছে যে, কি আশা করো তুমি ইউরোপের সন্তানের কাছ থেকে? ১৮ বছর বয়স হলেই তো সে তোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে বিদায় নেবে। বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে দেখার তার সময়ই হবে না। বৃদ্ধ বয়সে তুমি যখন চলতে-ফিরতে পারবে না তখন সে তোমাকে বৃদ্ধ নিবাসে রেখে আসবে এবং বছরে একবার তোমার জন্মদিনে হাতে একটা ফুলের তোড়া গুঁজে দিয়ে বলবে, আমার বান্ধবীর হাতে সময় নেই অতএব আমরা এখন আসি। শুভ নিজেকে প্রশ্ন করেছে, সন্তানের কাছ থেকে কি অবশ্যই প্রতিদান পেতে হবে? সন্তান তো তারই আনন্দের ফসল। প্রতিদানের আশা না করে তার সুন্দর ভবিষ্যতের আয়োজন করাই তো বাবা-মার দায়িত্ব। সন্তান ভবিষ্যতের সুন্দর ভুবনে প্রবেশ করতে পারলে, সেখানে পদচারণা করতে পারলেই তো বাবা-মা'র তৃপ্ত হওয়া উচিত। এলোমেলোভাবে শুভ চিন্তা করে। সে দাঁড়িয়ে আছে দুটি সমাজব্যবস্থার মাঝখানে। একটা তার মাতৃভূমি সেখানকার কাদা মাটি মেখে সে বড় হয়েছে, যৌবনের একটা অংশ সে খেলার মাঠে, সাংস্কৃতিক অঙ্গন ও রাজপথে কাটিয়েছে সেই বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা। দ্বিতীয়টা তার রক্ত প্রবাহিত যে সন্তানের শরীরে, যে সন্তান ইউরোপের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় বড় হবে সেখানে। শুভর ভাবনা খুঁজে ফেরে দুই দেশের মানুষের আচার-আচারণ, কথাবার্তা চিন্তা-ভাবনার মিল-অমিল। দুই সমাজের অনেক কিছুই শুভ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। আবার একটাকে পুরাপুরি ছেড়ে অন্যটার সঙ্গেও মিশে যেতে পারে না। এ এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। শুভর সেই সঙ্গে অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিনামূল্যে পরামর্শদাতাদের তীর্যক পরামর্শে শুভ মুষড়ে পড়েছিল, চোখে অন্ধকার দেখছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই মিনু পরিষ্কার করে দিয়েছে তার চিন্তাভাবনাকে। আশার আলো দেখিয়েছে শুভকে।

বৈশাখের অনুষ্ঠান শেষে মিনুর মায়ের অনুরোধ এড়াতে পারলেও মিনুর ছোট ভাইয়ের আবদার ফেরাতে পারেনি শুভ। দীর্ঘ সাত বছর পর শুভর খাওয়া হলো মিনুদের বাসায়। দীর্ঘ আট বছর মিনুরা বাবার সাহচর্যে ও ভালোবাসা ছাড়াই বড় হচ্ছে। ওদের বাবাকে নিয়ে গেছে স্বদেশেরই এক মহিলা। বাবা বেঁচে থাকতেও যাদের বাবা নেই তাদের বুকের মধ্যে যে কত গভীর বেদনা ও চাপা

কান্না লুকিয়ে আছে তার খবর কেউ জানে না। ওরা যে স্নেহ-ভালোবাসার কতোটা কাঙাল তার একটুখানি ছোঁয়া পেয়েছিল শুভ ঐ রাতে। মেট্রো স্টেশনে মিনুর ভাইকে কয়েকটা ক্যানডি ও কোক দিয়েছিলো শুভ। বাচ্চাদের মতো শুভও চকলেট পছন্দ করে জেনে আনন্দ, কৃতজ্ঞতা ও অবিশ্বাস্যতার অদ্ভুত মিশ্রণে তার মুখ থেকে এমনভাবে ধন্যবাদ শব্দটা বের হয়েছিলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করা কষ্টকর। শুভ লুডু খেলতে পারে জেনে সে মহাখুশি। একদান খেলতেই হবে। লুডু খেলার পর দু'জনে শুরু করলো মারামারি খেলা। তারপর ফুটবল এবং বক্সিংয়ের কিছু গল্প শোনার পর অশেষ তৃপ্তি নিয়ে মিনুর ভাই কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। মিনু অনুষ্ঠানে যায়নি। সারাদিন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। শুভরা যাওয়াতে সে জেগে উঠে তার নিজের ঘর গোছাতে শুরু করে। গত আট মাস নাকি সে ঘর গোছানোর সময় পায়নি। মেঝে থেকে শুরু করে ঘুমানোর খাটেও বইয়ের পাহাড় জমে গিয়েছিলো। পঞ্চম সেমিস্টারটা ছিলো সবচেয়ে কঠিন বিষয়। শুভ ভাত নিয়ে খাবার টেবিলে বসে মিনুকে অনুরোধ করায় সে গল্পে যোগ দেয়। মিনুর মা বিয়ে প্রসঙ্গে কথা উঠালো। তারও ঐ একই কথা, দেশে বিয়ে করলে সুখী হওয়া যাবে। শুভর ইচ্ছা হচ্ছিল অন্যরকম প্রশ্ন করার। কিন্তু তা না করে সে বললো, কথা হয়তো ঠিক, তবুও সন্তানের কি হবে? ছেলে যখন তার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমিই বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম বাবা এবং মুখে চুমু দেয়, তখন সে দৃশ্যের বিকল্প কিছুই হয় না। নতুন জীবনসঙ্গীর আগমনে যদি বাবা ও ছেলের এই ভালোবাসার ভাঙন ধরে, যদি বাবা-ছেলের দূরত্ব বেড়ে যায়, যদি বাবা হারিয়ে যায় তাহলে কি হবে? ছেলে তো তার বাবাকে খুঁজবে। হয়তো একদিন কাছে পেয়ে অভিযোগের পাহাড় চাপাবে বাবার কাঁধে। অথবা অভিমানের বোঝা বয়ে বেড়াতে না পেরে একটা গালাগালি দেবে বাবাকে। এসব কথা যখন হচ্ছিলো মিনু তখন মাথা নিচু করে ঘাড়ে হাত বুলাচ্ছিলো। শুভ খেয়ালই করেনি তার চোখে জল এসে গেছে। শুভ মিনুকে প্রশ্ন করে এ ব্যাপারে তোমার কোনো মন্তব্য নেই? আহত গোখরার মতো ঘাড়টা উঁচু করে আবার শ্রদ্ধানত হয়ে মিষ্টি করেই বললো, অবশ্যই! আমার তো আরও অনেক বড় মতামত থাকা উচিত। কেন না, আমার অবস্থাও তো একই রকম। সন্তানের কাছে বাবা তো বাবাই। বাবাকে সন্তান গালাগালি করবে এ কথা ঠিক নয়। তবে বাবার উচিত যেখানে, যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, সন্তানের প্রতি যথাসম্ভব তার দায়িত্ব পালন করা। অথচ আট আটটা বছর হয়ে গেল বাবা আমাদের দেখেনি। বাবা জানে না আমি কতো বড় হয়েছি, কেমন দেখতে হয়েছি। একটা বারও সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেনি, মিনু তোদেরকে দেখতে খুব ইচ্ছে হলো তাই এলাম। তোরা কেমন আছিস? ঈদে বা জন্মদিনে কোনো শুভেচ্ছা বার্তা বা উপহারও আসে না তার কাছ থেকে। পঞ্চম সেমিস্টারে আমি একাই প্রথম গ্রেড পেয়েছি। কতো খুশির সংবাদ আমার অথচ এই খুশি ভাগ করার মতো আপনজন কেউ বাইরে অপেক্ষা করে নেই। কারণ মা কাজে গেছে। মিনু বলেই চলেছে, কলেজে তার কদর বেড়ে গেছে। নিচের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তার পুরান বইগুলো কিনতে চায়। তাদের ধারণা বইগুলোতে মিনু নিশ্চই এমন কিছু দাগিয়ে রেখেছে যেগুলো পড়লে ভালো রেজাল্ট করা যাবে।

মিনু বলেছে, সেমিস্টার শেষ হলে আমার সহপাঠীরা যায় ভ্রমণে অথবা আয়েশ করে কোথাও। শক্তি অর্জন করে পরবর্তী সেমিস্টারে পড়াশোনা করার। অথচ আমাকে করতে হয় কাজ, কঠিন কাজ। যেন আমি আমার খরচ চালাতে পারি অথবা জামা-কাপড় কিনতে পারি। বাবা থাকলে নিশ্চয় আমাকে এতোটা করতে হতো না। পড়াশোনা করতে পারতাম নির্ঝঞ্ঝাটে।

মিনুর কথাগুলো প্রচন্ডভাবে নাড়া দিতে থাকে শুভকে। শুভ আবিষ্কার করতে থাকে তার সন্তানকে নতুনভাবে। অনুভব করতে তাকে তাদের গভীর ভালোবাসার টানকে। না, পৃথিবীর কোনো শক্তিই বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না ওদের এই ভালোবাসার থেকে। শুভর বিশ্বাস হয় না তার সন্তান ইউরোপের। পাঁচ বছরের যে ছেলে দেশে গিয়ে দীঘির জলে ঘন্টার পর ঘন্টা গোসল করে তৃপ্তি মেটায়। চামচ না নিয়ে ডাবের খোসা দিয়ে শ্বাস খায়, সে ছেলে চাপা কলা খেয়ে বলে ইউরোপের চেয়ে অনেক বেশি স্বাদ, গলদা চিংড়ির শুধুমাত্র পা থেকে যে শ্বাস খেতে চায়, দুপুর বেলা গাছ থেকে যে আম চুরি করে, পেঁপে আর লিচুর স্বাদে যে আনন্দিত হয় তাকে নিন্দুকেরা যতোই ইউরোপের বলুক না কেন, শুভ এখন সে কথায় কর্ণপাত করে না। শুভর ছেলে গবেষক হতে চায়। একদিন শুভ বাগানে কাজ করছে, হঠাৎ দেখে তার ছেলে কতোগুলো পাথর যার ওপর শ্যাওলা জমে গেছে, সেগুলো গোল করে সাজিয়ে মাঝখানে একটা ডাল পুঁতে পাশে বসে গেমবয় খেলছে। শুভ প্রশ্ন করাতে সে ঠোঁটে আঙুল রেখে বাবাকে বলে কথা বলো না, আমি শ্যাওলাগুলোকে নিরীক্ষণ করছি। জয়া একদিন শুভকে অনেকটা উদাস হয়ে প্রশ্ন করেছিল– আচ্ছা, তুই মরে গেলেও কি তোর ছেলে প্রত্যেক বছর ঐ লোকটার মতো দেশে আসবে? শুভ বলেছিলো, নিশ্চয় আসবে। দেখিস, টিউলিপের তোড়া নিয়ে সে আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, বাবা আমি তোমাকে জানাতে এসেছি যে আমি গবেষক হয়েছি। তুমি আমার বাঁধানো ছবির নিচে রবি ঠাকুরের কবিতার চরণ লিখেছিলে– মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদের লোক। আমি সে কথাও জানাতে এসেছি যে, আমি তোমাদের।

আব্দুল নাছির
Schiller STR-7, 63477 Maintal, Germany

Philips Lighting
PHILIPS